প্রাত্যহিক খবর

১৯ আষাঢ় ১৪১৮ বর্ষ-১ সংখ্যা-৩৩৯

গুজরাতের অপ্রিয় প্রশ্ন

গুজরাতের দাঙ্গার বয়স প্রায় দশ বছর হতে চলল। এতদিন পরেও সেই দাঙ্গা নিয়ে উঠছে হাজারো প্রশ্ন। এই দাঙ্গার তদন্তে একাধিক কমিশন তৈরি হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টও একটা অবস্থান নিয়েছে। নরেন্দ্র মোদির সরকারও প্রাণপণ চেষ্টা করেছে নিজেদের স্বচ্ছ এবং দক্ষ হিসেবে তুলে ধরতে। সত্যিই বছরের পর বছর নির্বাচনে জেতার পরেও এত অপ্রিয় প্রশ্নের মুখোমুখি হবে কেন? গুজরাত দাঙ্গার তদন্তে গঠিত নানাবতী কমিশনের কাছে তো তাদের স্বীকার করা উচিত ছিল, ওই সময়ের সব সরকারি দলিলপত্র ইতিমধ্যেই নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর সরকারি নথি নষ্ট করে দেওয়া হয়। সেসময়ের টেলিফোন কল রেকর্ড, লগবুক, অফিসারদের যাতায়াতের রেকর্ড, এমনকি, গোয়েন্দা রিপোর্টও নষ্ট করা হয়েছে ২০০৭ সালেই। ওই সব নথিতেই মিলত পুলিশ ও আমলারা কে কোন সময়ে কোথায় ছিলেন, কার কী ডিউটি ছিল। ওই সব নথি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল কারণ, সেগুলিতে নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর বিশ্বস্ত সহচর অমিত শাহর দাঙ্গায় কী ভূমিকা ছিল তা পরিষ্কার হত। সে সময়ের গোয়েন্দাকর্তাদের একজন সঞ্জীব ভাট সরাসরি কবুল করেছিলেন, হিন্দু ক্রোধের আগুন রাস্তায় নেমে আসুক, মুখ্যমন্ত্রী এমনটাই চেয়েছিলেন। পরে গুজরাত সরকার সেই অফিসারকে চূড়ান্ত আক্রমণ করে। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কথা বলে তিনি নিজের সীমা ছাড়াচ্ছেন, সরাকরি উকিল এমন মন্তব্যও করেছিলেন।

২০০২ সালে নানাবতী কমিশন তৈরি হয়। ২০০৭ সালে নথিপত্র নষ্ট করা হয়েছে। এটাই সবথেকে আশ্চর্যের যে, কোনও কমিশন এইসব নথিপত্র খতিয়ে দেখেনি। আরও আশ্চর্যের, যে সরকার জানে যে তার বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে, সেই সরকার নথিপত্র নষ্ট করে দিচ্ছে। ফলে প্রশ্ন উঠবেই। এই যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করে ফেলার জন্য গুজরাত সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছে কংগ্রেস। নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে কংগ্রেস মুখপাত্র মণীশ তেওয়ারি বলেছেন, গুজরাত দাঙ্গার তদন্ত এখনও চলছে। সর্বোচ্চ আদালত এই তদন্ত পরিচালনা করছে। এই অবস্থায় দাঙ্গার প্রমাণ নষ্ট করে দেওয়া যায় না। কিন্তু গুজরাত সরকার সেটাই করেছে। সত্য ঘটনাকে চাপা দেওয়ার জন্যই চক্রান্ত করে যাবতীয় প্রমাণ লোপাট করে দেওয়া হয়েছে।

গুজরাত সরকারের উচ্চপদস্থ আইনজীবী এস বি ভকিল জানিয়েছেন, গুজরাত দাঙ্গার প্রমাণ নষ্ট করে ফেলা হয়েছে জানতে পেরেই আইপিএস আধিকারিক সঞ্জীব ভাট সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরুদের ক্ষোভ সামাল দেওয়ার ব্যবস্থা করার বদলে দাঙ্গায় মদত দিয়েছিল রাজ্য সরকার। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে নানাবতী-অক্ষয় মেহতা কমিশন ভাটকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। কিন্তু কোনও প্রমাণ না থাকায় গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ খতিয়ে দেখা সম্ভব হবে না।

২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সবরমতী এক্সপ্রেসে আগুন লেগে পুড়ে গিয়ে ৬০ জন মারা যাওয়ার পরেই গুজরাতে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু মুসলিমরাই ওই ট্রেনটিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন কি না, তা আজও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি। তারপরই ছড়িয়ে পড়েছিল দাঙ্গার আগুন। এই দাঙ্গার ফলে সরকারিভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৯৭০ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের ২৫৪ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু বেসরকারি মতে, মৃতের প্রকৃত সংখ্যা দু'হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল, যার মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন মুসলিম। শিশু ও মহিলাদেরও রেহাই দেয়নি দাঙ্গাবাজেরা। পুড়িয়ে মারা হয়েছিল বেশ কয়েকজনকে। দাঙ্গায় আহত হয়েছিলেন ২,৫৪৮ জন। বহু সংখ্যালঘু মহিলাকে গণধর্ষণ করা হয়েছিল। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী সেসময় বলেছিলেন, সবরমতী এক্সপ্রেসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই সংখ্যালঘুদের আক্রমণ করছেন হিন্দুরা। এটা নিউটনের থার্ড ল। প্রতিটি ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। তাঁর এই বক্তব্য নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছিল। কিন্তু মোদির বিরুদ্ধে গুজরাত দাঙ্গায় মদত দেওয়ার অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি। ২০০৮ সালে সুপ্রিম কোর্ট গুজরাত দাঙ্গার সময় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থাকার অভিযোগের তদন্তে একটি বিশেষ প্যানেল গঠন করে। কিন্তু গুজরাত সরকার দাঙ্গার সব প্রমাণই নষ্ট করে ফেলায়, কোনও অভিযোগই আর প্রমাণ করা যাবে না।

যতবারই মনে হয় গুজরাত দাঙ্গা ধামাচাপা দিতে পেরেছেন মোদি, ততবারই একটা না একটা পুরোনো ঘটনার ভূত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সব অপ্রিয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে মোদিকেই।

ভারতবর্ষ

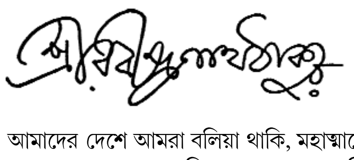

আমাদের দেশে আমরা বলিয়া থাকি, মহাত্মাদের নাম প্রাতঃস্মরণীয়। তাহা কৃতজ্ঞতার ঋণ শুধিবার জন্য নহে—ভক্তিভাজনকে দিবসারম্ভে যে ব্যক্তি স্মরণ করে তাহার মঙ্গল হয়—মহাপুরুষদের তাহাতে উৎসাহবৃদ্ধি হয় না, যে ভক্তি করে সে ভালো হয়। ভক্তি করা প্রত্যেকের প্রাত্যহিক কর্তব্য।

কিন্তু তবে তো একটা লম্বা নামের মালা গাঁথিয়া প্রত্যহ আওড়াইতে হয় এবং সে মালা ক্রমশই বাড়িয়া চলে। তাহা হয় না। যথার্থ ভক্তিই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে মালা বেশি বাড়িতে পারে না। ভক্তি যদি নির্জীব না হয় তবে সে জীবনের ধর্ম অনুসারে গ্রহণ-বর্জন করিতে থাকে, কেবলই সঞ্চয় করিতে থাকে না।

পুস্তক কতই প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু যদি অবিচারে সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি না থাকে—যদি মনে করি কেবল যে বইগুলি যথার্থই আমার প্রিয়, যাহা আমার পক্ষে চিরদিন পড়িবার যোগ্য, সেইগুলিই রক্ষা করিব—তবে শত বৎসর পরমায়ু হইলেও আমার পাঠ্যগ্রন্থ আমার পক্ষে দুর্ভর হইয়া উঠে না।

আমার প্রকৃতি যে মহাত্মাদের প্রত্যহস্মরণযোগ্য বলিয়া ভক্তি করে তাঁহাদের নাম যদি উচ্চারণ করি, তবে কতটুকু সময় লয়? প্রত্যেক পাঠক যদি নিজের মনে চিন্তা করিয়া দেখেন তবে কয়টি নাম তাঁহাদের মুখে আসে? ভক্তি যাঁহাদিগকে হৃদয়ে সজীব করিয়া না রাখে, বাহিরে তাঁহাদের পাথরের মূর্তি গড়িয়া রাখিলে আমার তাহাতে কী লাভ?

তাঁহাদের তাহাতে লাভ আছে এমন কথা উঠিতেও পারে! লোকে দল বাঁধিয়া প্রতিমা স্থাপন করিবে, অথবা মৃতদেহ বিশেষ স্থানে সমাহিত হইয়া গৌরব প্রাপ্ত হইবে, এই আশা স্পষ্টত বা অলক্ষ্যে মনকে উৎসাহ দিতেও পারে। কবরের দ্বারা খ্যাতিলাভ করিবার একটা মোহ আছে, তাহা তাজমহল প্রভৃতির ইতিহাস হইতে জানা যায়।

কিন্তু আমাদের সমাজ মহাত্মাদিগকে সেই বেতন দিয়া বিদায় করিতে চাহে নাই। আমাদের সমাজে মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ বিনা বেতনের। ভারতবর্ষে অধ্যাপক সমাজের নিকট হইতে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য দানদক্ষিণা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু অধ্যাপনার বেতন শোধ করিয়া দিয়া আমাদের সমাজ তাঁহাদিগকে অপমানিত করে না। পূর্বেই বলিয়াছি, মঙ্গলকর্ম যিনি করিবেন তিনি নিজের মঙ্গলের জন্যই করিবেন ইহাই ভারতবর্ষের আদর্শ। কোনো বাহ্য মূল্য লইতে গেলেই মঙ্গলের মূল্য কমিয়া যায়। **(চলবে)**

এপার ওপার

ব্যান্ডেল চার্চ স্থাপত্যশৈলীর অপূর্ব নিদর্শন

ইতিহাসের শিক্ষা বোধহয় এই যে, ঘটনার পর ঘটনা ঘটে, তবু নিত্যনতুন ঘটনা ধারার মধ্য দিয়ে নিরন্তর চলাই জীবন। আর এই চলার ছন্দ থেকেই নূতন নূতন দিগন্তের আবির্ভাব ঘটে। হুগলি জেলার অন্যতম দ্রষ্টব্য 'ব্যান্ডেল চার্চ' যেন ইতিহাসের এই শিক্ষারই এক মূর্ত রূপ। কলকাতা থেকে সামান্য দূরের এই চার্চটিতে এলে নিজের অজান্তেই পৌঁছে যেতে হবে সেই পাঠান রাজত্বের সময়কালীন ইতিহাসের জীর্ণ পাতায়। বিশ্বখ্যাত এই চার্চের শুরুর কাহিনি সেই সুদূর ১৫৩৭ সালে বাংলার মাটিতে পর্তুগিজদের প্রথম পদার্পণ থেকেই শুরু হয়। সেসময় গৌড়ের পাঠান নবাব মহম্মদ শাহ গোয়ার পর্তুগিজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কারণ, তখন তিনি ইতিহাসখ্যাত শের খানের দ্বারা বিপর্যস্ত। সাহায্যের পুরস্কারস্বরূপ পর্তুগিজরা নবাবের কাছে এক কারখানা তৈরি করার অনুমতি পায়। কারখানা তৈরি হয় বর্তমানে হুগলি জেলের কাছাকাছি এক অঞ্চলে। এরপরই ১৫৭৯ সালে হুগলি নদী বা গঙ্গার তীরে পর্তুগিজরা গড়ে তোলে বাণিজ্যিক এক বন্দর এবং দুর্গ যা হয়ে ওঠে বাংলার বাণিজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এই বন্দর তৈরির ঠিক এক বছর পরেই মুঘল সম্রাট আকবরের প্রিয় পর্তুগিজ ক্যাপ্টেন পেড্রো ট্যাভরেস হুগলিতে খ্রিস্টধর্ম প্রচার এবং চার্চ তৈরির অনুমতিটিও পেয়ে যান। এবং অবশেষে ১৫৯৯ সালে পর্তুগিজদের তৈরি সেই কারখানার এক মাইল দূরে তৎকালীন গ্রাম ব্যান্ডেল চার্চ তথা খ্রিস্টধর্ম চর্চা কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

এ তো হল একেবারে শুরুর কাহিনি। আজ যে ব্যান্ডেল চার্চ দেখা যায়, সেটি কিন্তু ১৫৯৯ সালের চার্চটি নয়। কারণ ১৬৪০ সালে মুঘল সম্রাট সেই চার্চ ধ্বংস করে দেন। এই ধ্বংসের কাহিনিও বড় মর্মান্তিক। পর্তুগিজদের মধ্যে গভর্নর-সহ প্রায় চার হাজার পুরুষ মানুষকে জীবন্ত পোড়ানো হয়

সম্রাটের নির্দেশে, মহিলা এবং শিশুদের বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয় আগ্রায়। মর্মান্তিক এই ঘটনার পর ১৬৬০ সালে গোমেজ ডি সোটো তৈরি করলেন নতুন এই চার্চ। তবে বহু যন্ত্রণার সাক্ষী পুরোনো সেই চার্চের রয়ে যাওয়া পাথর আজও এখানে এলে দেখা যাবে, সযত্নে রাখা আছে।

পূর্ব ভারতের এই খ্রিস্টান চার্চ 'ব্যাসিলিকা' নামে পরিচিত হয় ১৯৮৮ সালে, পোপ জন পল টু কর্তৃক এক ডিক্রির মাধ্যমে। এই চার্চ মাতা মেরির নামে নিবেদিত। মাতা মেরি এখানে লেডি অফ দ্য রোজারি এবং আওয়ার লেডি অফ হ্যাপি ভয়েজ নামে খ্যাত। ব্যান্ডেল চার্চ বা ব্যান্ডেল ব্যাসিলিকা শুধুমাত্র ঐতিহাসিক কিছু কাহিনির সাক্ষীই নয়, এই চার্চকে ঘিরে প্রচলিত আছে প্রচুর আলৌকিক কাহিনিও। এই সমস্ত অলৌকিক কাহিনি আজও সমস্ত ধর্মের মানুষের অন্তরের বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস জোরে তাঁরা আসেন, প্রার্থনাও করেন। এই চার্চের মাতা মেরিকে ঘিরেও প্রচলিত আছে অলৌকিক কাহিনি। চার্চে রাখা আছে ষোড়শ শতকের এক জাহাজের বিশাল এক মাস্তুল । বিশালকায় এই মাস্তুলও মাতা মেরির অলৌকিক আশীর্বাদের এক স্মৃতিরূপ।

বর্তমানে ব্যান্ডেল চার্চ একটি বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র। চার্চের অভ্যন্তরীণ স্থাপত্যশৈলীর বহু পর্যটককে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে সারা বছর। পর্তুগিজ স্থাপত্য অপরূপ শৈল্পিক স্থাপত্য সূচনা যা চার্চের প্রতিটি কোনায় কোনায় ছড়িয়ে আছে। চার্চের রয়েছে অনেক স্মৃতিফলক। এই চার্চেই রয়েছে মাইকেলেঞ্জোলোর বিখ্যাত এক স্থাপত্যকর্মের রেপ্লিকা বা প্রতিরূপ। চার্চে এলে চোখে পড়বে সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি মৃত যিশুকে কোলে নিয়ে বসে থাকা মাতা মেরির বিখ্যাত সেই প্রতিরূপ, যা মনকে বেদনাসিক্ত করে তুলবেই। ব্যান্ডেল চার্চের ঐতিহাসিক মূল্য যতটা মূল্যবান, চার্চের কর্তৃপক্ষ, সিস্টারদের সমাজের প্রতি সেবাও ততখানিই অমূল্য। এই চার্চ কর্তৃপক্ষ স্কুল চালান, মিশনারি সিস্টাররা প্রত্যন্ত জেলায় জেলায় গিয়ে দরিদ্র শিশু-মহিলাদের উন্নতির জন্য কাজ করেন। আরও অনেক সেবামূলক কাজকর্ম করে চলেছেন এই চার্চ কর্তৃপক্ষ, অবিরাম। সাধারণ দর্শনার্থী, পর্যটকদের পাশাপাশি এই চার্চে এসেছেন মাদার টেরেসার মতো অসাধারণ মানুষও। ইতিহাস কোনও নির্দিষ্ট নিয়মে চলে না। অনেক অন্ধকারের মধ্য দিয়েই ইতিহাস আলোর স্বপ্ন দেখায়। আর তাই কালের নির্মম আঘাতের পরেও 'ব্যান্ডেল চার্চ' এক গৌরবময় প্রতীক হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসিম। আজকের দিনে এই স্থাপত্য ভাস্কর্যের নিরিখেও অমূল্য। তবে 'ব্যান্ডেল ব্যাসিলিকা'র সবচেয়ে বড় মূল্য হয়তো মানুষের বিশ্বাস আর প্রার্থনা। যার দৌলতে এই গৌরবসূর্য কোনও দিন অস্তমিত হবে না।

লেখা: কাশ্মীরা ভট্টাচার্য
ছবি: ঝিলাম গুপ্তা

সর্বজয়া বিলকিস

চরের জমিতে পাকা সর্ষে গাছগুলি কাঁচি দিয়ে কচকচ করে কেটে চলেছেন এক নারী। তাঁর পাশে রয়েছেন কয়েকজন পুরুষ কৃষকও। কিন্তু ফসল কেটে পুরুষ শ্রমিকদের পিছনে ফেলে সামনের দিকে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছেন তিনি। ময়মনসিংহ সদর উপজেলার চরাঞ্চল পরাণগঞ্জ ইউনিয়নের চরবৌলা গ্রামের পাশ দিয়ে যাওয়া পাকা সড়ক থেকে গ্রামের ফসলের মাঠে ব্যতিক্রমী এই দৃশ্যটি চোখে পড়ে। পাকা পথ থেকে নেমে সর্ষেখেতে গিয়ে কথা হয় ওই কৃষাণীর সঙ্গে। সর্ষেখেত তাঁরই। সঙ্গে থাকা অন্যেরা হলেন দিনমজুর। দিনমজুরদের সঙ্গে বাড়ির কর্ত্রী যেভাবে কাঁচি চালাচ্ছেন, তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। বিলকিস পারভীন সেই কাজটিই করছেন। এত তাড়াতাড়ি কীভাবে ফসল কাটছেন জিজ্ঞেস করলে প্রাইমারি স্কুলপড়ুয়া তিন ছেলের মা বিলকিস বলেন, 'শুধু এটা কেন, আমি ধান, নাইল্যা (পাট) সবই কাটতে পারি বাড়িতে যে সেচ আছে, সেই মেশিনও আমি চালাই'। আপনার তো অনেক গুণ, একথা বলার পর বিলকিস বলেন, 'আমার বাড়িতে গাই (গাভি) আছে চাইরটি, বাছুর, ছাগল আছে ১০-১২টি, আর মুরগি ১৫-১৬টি। সবগুলারে আমিই দেখশুনা করি'। এতকিছু কীভাবে করেন জানতে চাইলে বিলকিস জানান, ছোটবেলা থেকেই ঘরের কাজ, মাঠের কাজ সবই তিনি করতেন। কাজ করতে করতেই পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। সময় মেনে সব কাজই তিনি সারেন। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ির কাজ, ফসল কাটা কিংবা ফসল সংরক্ষণ, ছেলেদের পড়াশোনা, সবকিছু তিনি ভালোভাবেই নজর রাখেন। কাজ করতেই ভালো লাগে তাঁর। কথা শেষ করে দ্রুত আবার কাজে লেগে পড়েন বিলকিস পারভীন। বিলকিসের স্বামীর নাম আইয়ুব আলী। সর্ষেখেত থেকে কিছুটা দূরে দেখা মিলল আইয়ুব আলীর সঙ্গে। স্ত্রীর প্রসঙ্গ তুলতেই হাসিমুখে বললেন, 'ও খুব পরিশ্রমী। ও সবই পারে। সংসারের সবকিছুই ও দেখাশোনা করছে'।

ন্যাশভিলে বঙ্গ সম্মেলন

আমেরিকার টেনেসি প্রদেশের রাজধানী গানের শহর ন্যাশভিলে দ্বিতীয় আঞ্চলিক বঙ্গ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল গত ২৪ থেকে ২৬ জুন। আয়োজক সংস্থা বৃহত্তর ন্যাশভিল বাঙালি সংঘের পক্ষ থেকে সভাপতি ভবেন্দ্র পুততুন্ড জানালেন, এই সম্মেলনে ভারত-আমেরিকা-কানাডা-বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় দু'হাজার বাঙালি জড়ো হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন 'ভারত দিবসে' বেশ কয়েকশো বাঙালি পরিবার জড়ো হয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিন 'দুই বাংলার মিলন দিবস'-এ

ছিল সার্ধশতবর্ষে 'রবীন্দ্র-শ্রদ্ধাঞ্জলি'র আয়োজন। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে ছিল কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, অনীক ধর, অন্বেষা দত্তগুপ্ত, মনোময় ভট্টাচার্য এবং স্বপন বসুর গান। শেষ দিনে 'চলো পটল তুলি' নাটকটি অভিনয় করে মঞ্চ মাতিয়ে দিলেন চার্বাক-এর শিল্পীরা। চলচিত্র উৎসবে বেশ কিছু হালের সিনেমা ও 'রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র' তথ্যচিত্রটি নিয়ে এসেছিলেন সুমিতা ভট্টাচার্য। এছাড়াও শাড়ি-গয়না-সিডি-ডিভিডি-বই- সহ দেশের নানা পণ্যের সম্ভার নিয়ে আরবিসি'তে যোগ দেন বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থার প্রতিনিধিরা। রোজকার কাজের মাঝে এই তিন দিনের অবসরে সঙ্গে ছিল বাঙালির প্রিয় খাওয়াদাওয়া আর আড্ডা। এছাড়া প্রতিদিনই নানা বিষয়ে (শিল্প, সংস্কৃতি, বাণিজ্য, সাহিত্য ও স্বাস্থ্য বিষয়ক) আলোচনা এবং বিতর্কসভার আসর বসে এই সম্মেলন।

লেখা: শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

সুন্দরবনে সহেলির দেখা পেতেও পারেন

সহেলি সুন্দরবনের সুন্দরী পাখিগুলির মধ্যে অন্যতম। সে কী রূপ! প্রকৃতি বুঝি নিজের হাতে সহেলির পালকে রঙের তুলি ঘষে দিয়েছে। সেই অহঙ্কারে বাঁচে না সহেলি। না হলে কেন তাদের যত্রতত্র দেখা মেলে না! শুধু সুন্দরবনের ভিতরেই ওদের বাস। কালেভদ্রে পার্বত্য চট্টগ্রামে সহেলির দেখা মিললেও তা একেবারেই অপ্রতুল।

সুন্দরবন থেকে খুব একটা বের হয় না সহেলি পাখি। এমনকী বনের আশপাশের লোকালয়েও এগুলির আনাগোনা নেই বললেই চলে। খাওয়াদাওয়া আর গান করা সবই চলে সুন্দরবনের ভিতরে। সাধারণত পোকামাকড় খেয়ে ভূরিভোজ সারে ওরা। তারপর খেয়েদেয়ে অলৌকিক সুরে গান ধরে সহেলি। এরা পালা করে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে সুর তোলে। সকাল, দুপুর, বিকেল এই তিনটি নির্দিষ্ট সময়ে গান গাওয়া ওদের চিরাচরিত অভ্যাস। গান গাওয়ার কৌশলটাও ভিন্ন ধাঁচের। এক প্রান্ত থেকে একটি পাখি গান ধরে, অন্য প্রান্তের পাখিটির কাছে গিয়ে সুর শেষ হয়। অর্থাৎ, সহেলি পাখি যখন দলবদ্ধ হয়ে কোনও ডালপালায় বসে, তখন প্রথমে একটি পাখি মনের আনন্দে গেয়ে ওঠে। তারপর শুরু করে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ। এভাবে ডালে বসা সব সহেলিই গাইতে থাকে। তবে অবশ্যই একটার গান শেষ হলে অন্যটা সুর মেলায়। এভাবে সবার গান শেষ হলে প্রথমটা আবার শুরু করে। সহেলি পাখির গানে ভীষণ আবেগ।

ওদের মিষ্টি সুরের সঙ্গে মিষ্টি চেহারায় মানুষ মুগ্ধ না হয়ে পারে না। অদ্ভুত সৌন্দর্য তাদের। পুরুষ পাখির বুকের দিকটা টকটকে লাল রঙের। কপাল, গলা, ঘাড় কুচকুচে কালো। ডানার উপরিভাগ কালো। লেজের উপরিভাগ কালো হলেও সাদা সরলরেখার টান রয়েছে। তাতে সৌন্দর্যটা আরও বেড়ে গিয়েছে। পা কুচকুচে কালো। ঠোঁটদু'টি দুই বর্ণের। নীচের অংশ কালো আর উপরের অংশ ধাতব সাদা।

অন্যদিকে, স্ত্রী সহেলির বর্ণ বিপরীত। বুক, পেট ও লেজের নীচে উজ্জ্বল হলুদ। মাথা, ঘাড় ও পিঠ ধূসর ছাই রঙের। মসৃণ ঝকঝকে পালিশ করা থাকে যেন পিঠের দিকটা। তবে দৈর্ঘ্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সমান। গড়ে সহেলি পাখি ১৮-২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়।

সুন্দরবনে সহেলি পাখির প্রধান শত্রু বানর। ওরা সহেলি পাখির ডিম-বাচ্চা সাবাড় করে ফেলে। ফলে বাধ্য হয়ে সহেলি অতি গোপনীয় স্থানে বাসা বাঁধে। স্থান নির্বাচন করতে চার-পাঁচ দিন লেগে যায়। বাসা বাঁধতে লাগে আরও চার-পাঁচ দিন। তারপর কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে দুই থেকে চারটি ডিম পাড়ে স্ত্রী সহেলি। পালা করে পুরুষ ও স্ত্রী সহেলি ডিমে তা দিয়ে ১৫-২০ দিনের মধ্যে ডিম ফোটায়। সাপের উপদ্রব থেকে বাঁচতে নানা ধরনের ডালপালা দিয়ে বাসাটাকে ঢেকে রাখে।

বনপথ থেকে বিশ্বের পথে ড. হুদা

এ যেন রবীন্দ্রনাথেব 'ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি, বনের পথে যেতে' গানের সেই উদাসী পথিক, যিনি ঘাস, ফুল আর বনের মাঝে প্রকৃতি-বন্দনায় ছিলেন বিভোর। কিন্তু 'ফুলের গন্ধে' নয়, বাংলাদেশের এক প্রকৃতিপ্রেমিক গবেষকের চমক বিলুপ্তপ্রায় অর্কিড রেকর্ড গবেষণায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের তরুণ শিক্ষক ড. কামরুল হুদা অর্কিড গবেষণায় বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্তপ্রায় চার প্রজাতির অর্কিডের সন্ধান পেয়েছেন। বিলুপ্তপ্রায় এসব ওষধি অর্কিডের জীবসক্রিয় যৌগ নির্ণয়, তা পৃথকীকরণ এবং যৌগের গঠন নিয়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য বিশ্বের অন্যতম অর্কিড গার্ডেন ও লন্ডনের এভারডিন ইউনিভার্সিটিতে আমন্ত্রণ পেয়েছেন।

অর্কিড সংগ্রহ তাঁর নেশা। আর পেশা অর্কিডের জীবনবিন্যাস নিয়ে গবেষণা। শখের বশে কৈশোর থেকে লতাপাতার সঙ্গে বসবাস। কামরুল হুদা বলেন, 'আমার অর্কিড গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয়েছে, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অর্কিডে জীববৈচিত্রের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে প্রজনন জীববিদ্যাতেও তার প্রভাব আছে। এছাড়া অর্কিড ফুলের পরাগায়ণের সময়কালে বিভিন্ন ধরনের পুষ্পীয় বৈশিষ্ট্য যেমন, ফুলের আকার, গন্ধ, মধুগ্রন্থি, স্পারের মধ্যে বৈচিত্র্য আর ছন্দ তুলে ধরেছি।' লন্ডনের এভারডিন ইউনিভার্সিটিতে গবেষণার জন্য আমন্ত্রণ পাওয়া প্রসঙ্গে তিনি জানান, আগামী আগস্টে বাংলাদেশের দুষ্প্রাপ্য কয়েক প্রজাতির অর্কিড নিয়ে এভারডিন ইউনিভার্সিটিতে 'মেডিসিন প্লান্ট' বিষয়ক গবেষণা শুরু করবেন তিনি। বর্তমানে তাঁর গবেষণার শিরোনাম' পরাশ্রয়ী এবং স্থলজ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অর্কিডের প্রজনন সফলতার ওপর বৈশিষ্ট্যের প্রভাব।' গবেষণা প্রবন্ধটি অর্কিড বিষয়ক বিখ্যাত জার্নাল অয়কোলজিয়ায় (Oecologia) প্রকাশিত হয়েছে। অর্কিডের সন্ধানে দেশ চষে বেড়ানো এই তরুণ বিজ্ঞানী নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে তুলেছেন বিস্ময়কর এক অর্কেডিয়াম, যা তাঁকে এনে দিয়েছে বিশ্বস্বীকৃতি। বর্তমানে তিনি অর্কিডের প্রজাতি বিষয়ক গবেষণা, ডিএনএ সিকোয়েন্সিং গবেষণা, বারকোডিংয়ের কাজ সম্পন্ন করা, ওষধি অর্কিডের জীবসক্রিয় যৌগ নির্ণয়, তা পৃথকীকরণ এবং যৌগের গঠন নিয়ে গবেষণা করছেন।

বিশ্বব্যাপী অর্কিড প্রজাতি সংরক্ষণে অবদান রাখার জন্য সম্প্রতি তিনি আইইউসিএনের অর্কিড বিশেষজ্ঞ দলের সদস্য হিসেবে আন্তর্জাতিক পদ লাভ করেন। রাঙামাটির নানিয়ারচর এলাকায় কামরুল হুদা খুঁজে পান বিলুপ্তপ্রায় অর্কিড লুসিয়া মাইক্রেন্তা। এই প্রজাতিটি পৃথিবী থেকে ৫০ বছর আগে হারিয়ে গিয়েছে বলে শনাক্ত করেন লন্ডনের 'রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেন কিউ'র খ্যাতনামা বিজ্ঞানী জেফ উড। এছাড়া ইউলোপিয়া জেনিকাল্টা নামক অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির অর্কিড পাওয়া গিয়েছে

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাটাপাহাড়ে। ২০০৯ সালে তাঁর নেতৃত্বে গবেষণায় শিক্ষার্থীরা বিলুপ্তপ্রায় এই প্রজাতিটি খুঁজে পান। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাটাপাহাড় এলাকায় তিনটি, রাঙামাটির নানিয়ারচর ও কাপ্তাই এলাকায় দু'টি দুষ্প্রাপ্য অর্কিডও পেয়েছেন তিনি।

চিঠিপত্র

একই দেশ, তাতে যেন দুই ভারত !

মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার মানুষ। রোজগার বাড়ছে না অথচ খরচ বেড়েই চলেছে। যারা বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি মিল-মালিক, প্রোমোটার, ডাক্তার, ঠিকাদার, এদের কোনও অসুবিধা নেই। সরকারি চাকুরিজীবী, এদের বেতন মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। এরা সব সুয়োরানির সন্তান। অর্থাৎ, একদল লোক টাকার পাহাড়ে বসে আছে, আরেক দল অর্ধাহার, অনাহার, অপুষ্টিতে মরছে। তাই শীর্ষ আদালত প্রশ্ন তুলেছে, দেশ তো একটাই, তাতে দুই ভারত কেন?

এই মুহূর্তে ভারত খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভর। গুদামগুলি খাদ্যশস্যে উপচে পড়ছে। কিন্তু দেশের অসংখ্য মানুষ খেতে পান না। অপুষ্টি থাবা বসিয়েছে দেশের বিরাট অংশে। এই ব্যবস্থার প্রতিকার চেয়ে মামলা করেছে (পিইউসিএল)। আজও অনাহার, অপুষ্টিতে মানুষ মরছে এটা লজ্জাজনক। ২০ এপ্রিল বিচারপতি দলবীর ভাণ্ডারী ও দীপক বার্মা অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল মোহন পরাশরণকে বলেন। আপনি বলছেন দেশে যথেষ্ট খাদ্যশস্য রয়েছে তাহলে অনাহারে মানুষ মরছে কেন? উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে সুপ্রিম কোর্ট এইসব মানুষের কাছে দ্রুত খাদ্যদ্রব্য পৌঁছে দিতে বলেছে।

রাস্তাঘাটে সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করেন সরকারি চাকুরিজীবীদের এত বেতন কেন? বাবু আপনি এদের বেতন কমানোর কথা লিখুন। আরেকটা কথা, একটা ঘরে এতগুলি চাকরি কেন? আমি উত্তর দিতে পারি না। বড় অসহায় লাগে নিজেকে। এ কোনও ভাবাবেগের কথা নয়। নগর সভ্যতায় অভ্যস্থ, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত, বিলাসব্যাসনে থাকা মানুষেরা মাটির কাছে আসুন, তাহলে আপনারাও মাটির মানুষদের কথা শুনতে পাবেন।

শ্রী প্রশান্ত কর, বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া

'অস্ত্র' উদ্ধারের গল্প!

একটি পত্রিকার প্রথম পাতায় বেশ বড় করে অস্ত্র উদ্ধারের গল্প ফাঁস করা সম্পর্কে বলা হয়েছে। সংবাদটি মন দিয়ে পড়েছি। কিছু কথা এ ব্যাপারে বলতে চাই। কথাটা না হয় সত্যি বলেই মেনে নিচ্ছি যে, তল্লাশির নামে নিজেদেরই সঙ্গে আনা অস্ত্র বাড়ির ভিতরে রেখে দিয়ে তাণ্ডব চালাচ্ছে তৃণমূল। এতে বাড়ির মহিলারা তীব্র প্রতিবাদ জানান বলে বলা হয়েছে। মিথ্যা ছেপে লাভ কিছুই হবে না। বরং খারাপই হবে।

এখন প্রশ্ন হল, ওইসব অস্ত্র কি এখনই তৈরি করে অথবা কিনে আনা হচ্ছে? এবার বলতেই হয়, ওইসব অস্ত্র এখনই তৈরি বা কিনে আনাও হচ্ছে না। সবই আগে থেকেই কোথাও জমা ছিল।

এবার প্রশ্ন, ওইসব অস্ত্র এতদিন কাদের হেপাজতে ছিল? হয়তো ওইসব অস্ত্র জোটের হেপাজতে লুকোনো ছিল, তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি। নির্বাচন কমিশনও বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের কথা ঘোষণা করেছিলেন। উদ্ধারের কাজ চলেও ছিল। সকলেই তা জানেন। বামফ্রন্ট তখন পূর্ণ ক্ষমতায়। তাহলে সেসময় ওইসব অস্ত্র উদ্ধার করা হল না কেন? পুলিশ প্রশাসন তো তখন সিপিএমের হাতে ছিল!

এবার সহজেই বলা যায়, ওইসব অস্ত্র নিশ্চয়ই কংগ্রেস-তৃণমূল জোটের নয়। পুরোপুরি না হলেও ৯০ ভাগ বামফ্রন্টের তথা সিপিএমের। ক্ষমতা হারিয়ে কেলেঙ্কারি ঢাকতে প্রলাপ বকছে সিপিএমের নেতারা। আর অস্ত্র কারখানা, যার সম্প্রতি খোঁজ মিলেছে? কারখানাও কি দুম করে বসানো হয়েছে?

আমি সিপিএম নেতাদের সরাসরি বলছি ৩৪-৩৫ বছর তো কেবল মিথ্যা কথা, হুমকি, খুন ইত্যাদির দ্বারা কাটালেন। আর কেন? এবার প্রতিদিন অন্তত ২-৪টা সত্য বাক্য বলা অভ্যাস করুন। তাতে খানিকটা হলেও মঙ্গল হবে। পরিশ্রমী হওয়ার চেষ্টা করুন। বিলাসিতা ত্যাগ করুন। বেশিরভাগ মানুষ যা খান, আপনারাও তাই খাওয়ার অভ্যাস করুন। উপকার হবেই। পুরোনো চিন্তাধারা ত্যাগ করুন। হিংসা বর্জন করুন।

বিশ্বনাথ রায়, খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর